দৈনিক ইনকিলাব

২০৫

তারিখ NOV. 1 5 1999
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

চঃবিঃতে অছাত্র সন্ত্রাসীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক

ছাত্রলীগ নামধারী দুর্বৃত্তরা অবাধে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি ও মুক্তিপণ আদায়ের কাজে লিপ্ত

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়ার পর বর্তমানে সেখানে অছাত্র সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হলে ঘাঁটি করে এই দুর্বৃত্ত দল বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও মুক্তিপণ আদায়ের মত দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। রাতের বেলায় হলের ভেতর নীলছবির প্রদর্শনী এবং গাঁজা, ফেনসিডিল ও বাংলা মদের আসর বসে। অতিরিক্ত মদপানে অনেকে যত্রতত্র বমি করে বসে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। মানসিক নিপীড়ন চলছে হলের নিরীহ ছাত্রদের উপর। ক্যাম্পাসে তিন শতাধিক পুলিশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সত্ত্বেও অছাত্র দুর্বৃত্তদের এসব কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও চরমভাবে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ৫ শতাধিক দোকান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে রয়েছে হাটহাজারী সদর বাণিজ্যকেন্দ্র ও মদনহাট। এছাড়াও এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু ইটের ভাটা এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প-কারখানা।

সূত্র জানায়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা পরিচয়ে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজি শুরু হয়। ক্যাম্পাসে কর্মরত বিভিন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে আদায় করা হয় মোটা অংকের চাঁদা। হোটেল, স্টেশনারী, মুদির দোকান, পানের দোকানে খাওয়া-দাওয়া ও কেনাকাটা করে বীরদর্পে চলে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। জানা গেছে, এসব দোকানে ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের ৫ টাকা থেকে শুরু করে কোন কোন দোকানে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনাদায়ী দেনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, দুর্বৃত্ত দলের কোন কোন সদস্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর মাসের শেষে ফোনের বিলটি ধরিয়ে দেয় কোন না কোন ব্যবসায়ীকে।

এভাবে বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, মদ থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনের বিল পর্যন্ত চাঁদাবাজি করে আদায় করা হচ্ছে। আর এভাবে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সূত্রমতে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় বণিক সমিতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির ৪ জন শীর্ষ স্থানীয় নেতাকে শাহজালাল হলের একটি কক্ষে ডেকে নেয়া হয়। এর পর তাদের কাছ থেকে মাসিক হারে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করা হয়। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সাথে দফারফার পর একটি চুক্তিও হয়েছিল। সূত্রমতে, চুক্তিতে শর্ত ছিল যে, কোন ব্যক্তিকে এককভাবে চাঁদা দেয়া হবে না। ব্যক্তিবিশেষের কাছে যেসব অনাদায়ী দেনা রয়েছে সেগুলো আদায় করা হবে। ক্যাম্পাসে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী উপলক্ষে যথাযথ 'সহযোগিতা' করা হবে। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী কাজ হওয়ার আগেই বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ায় ক্যাম্পাসে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। ইতোমধ্যে ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ব্যবসায়ী অন্যত্র দোকান নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বণিক সমিতি গত শনিবার প্রোক্টরের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগনামা পেশ করেছে। প্রোক্টর ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিন ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদাবাজ দুর্বৃত্তদের তালিকা চেয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রোক্টর ডঃ গাজী সালেহ উদ্দিন বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধান দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। তারপরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তি নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্র জানায়, চাঁদাবাজ গ্রুপের সদস্যরা অধিকতর তরুণ এবং অস্থির প্রকৃতির। কথায় কথায় তারা অস্ত্রের ভয় দেখায় এবং নিজেদের কোন কোন সময় শহরের নাসির বাহিনী, কাদের বাহিনী বা মামুন বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেয়। সূত্রের ধারণা যে, তাদের কাছে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে। শহরের পেশাদার অপরাধীদের সাথে তাদের রয়েছে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সময়-সুযোগে শহরের কোন কোন অপারেশনেও তারা অংশগ্রহণ করে। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘাঁটি হিসেবেও এই দুর্বৃত্ত গ্রুপ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্র আরো জানায় যে, এই দুর্বৃত্ত নেটওয়ার্ককে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে কয়েকটি গাঁজা-ফেনসিডিল ও মদের আড্ডা। হলের কোন কোন কক্ষে অবাধে মাদক সেবন চলে এবং মাদকসেবীরা ছাত্রদের সামনে মাতলামী করে। অনেক সময় তারা যত্রতত্র বমি করে দেয়। হলের টেলিভিশনে তারা ভিসিপি সংযোগ করে নীল ছবির প্রদর্শনীরও আয়োজন করে। এ ব্যাপারে নিরীহ ছাত্ররা হল প্রভোস্টদের কাছে আবেদন করেও কোন প্রতিকার পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে অপর একটি সূত্র ধারণা করছে যে, ছাত্রলীগের পরিচয়ে তৎপর এই দুর্বৃত্ত নেটওয়ার্কের সাথে প্রশাসনের কোন কোন কর্মকর্তারও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের কর্মকর্তাগণও বিশেষ মাসোহারা পেয়ে থাকে। পুলিশ কর্তাদের অছাত্র ব্যক্তিদের সাথে খোশগল্প করতে দেখা যায়। পুলিশের একজন কর্মকর্তা দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারের ব্যাপারে তার অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন।